7th Krishna Trust Memorial Lecture 2020

নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে লিঙ্গ সচেতনতা

অনিতা অগ্নিহোত্রী

Anita Agnihotri -*A Noted Litterateur*

SEVENTH KRISHNA BHATTACHARYA MEMORIAL LECTURE 2020

নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে লিঙ্গ সচেতনতা

অনিতা অগ্নিহোত্রী

কৃষ্ণা মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সপ্তম কৃষ্ণা মেমোরিয়াল ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি । গত সাত বছর ধরে কৃষ্ণা ট্রাস্ট প্রান্তিক মেয়েদের শিক্ষা, তাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করে চলেছে। একই সঙ্গে অ্যালজাইমার্সের মত দুরারোগ্য অসুখের রোগী ও তাদের সহায়কদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন । এই সমস্ত বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে প্রায়শই কোন সরকারি সহায়তা বা অভিনিবেশ পৌঁছয় না। নৈশঃব্দেরও ভাষা আছে। সেই ভাষার অক্ষরগুলি পড়ে পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার অধ্যবসায় আছে কৃষ্ণা মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কর্মীদের ।

পূর্ববর্তী বক্তাদের মত গবেষণা বা অধ্যাপনার সুযোগ আমার হয়নি । ছাত্রজীবনে অর্থনীতির পাঠ নিয়েছিলাম। আমার কর্মজীবনে কাজ ছিল হাতে কলমে। নীতি প্রণয়নে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার কাজ আরম্ভের আগে কর্মজীবনের গোড়ার দিকে মহকুমা ও জেলা স্তরে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। পরবর্তী কালে এই রূপায়নের ফলাফলকে বিভাগ বা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সমীক্ষা করেছি, অন্যদের কাজের তত্ত্বাবধানও

করেছি। আমার যাবতীয় শেখা ও ভাবনা এই দুই প্রক্রিয়ার ভিতর থাকতে গিয়েই। আজ যা বলব, তাতে সেই চিন্তার কিছু বিশ্লেষণ থাকবে। আজকের এই আলোচনার ফলে ট্রাস্টের যে উদ্দেশ্য এবং কাজ, তা কিছু অনুসন্ধানের মাধ্যমে গবেষক ও পণ্ডিতদের অভিনিবেশ পেতে পারে, এমন আশা করছি। জনসংখ্যার অর্ধেক মেয়েরা। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারে অথবা রাজ্য স্তরে নীতি যখন তৈরী হয়, কিংবা তার রূপায়ণ হয় তখন লিঙ্গ সাম্যের ব্যাপারটি মনে না রাখা বা উপেক্ষা করা, দুটোই ঘটে থাকে। মেয়েদের জন্ম পূর্ববর্তী অবস্থা থেকেই এর আরম্ভ। মেয়েদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, কর্মপরিবেশে যোগদান- এই সমস্ত স্তরেই লিঙ্গ বৈষম্যের ফলাফলগুলি দৃশ্যমান হয়। উন্নয়নের যে ফল, তারই মধ্যে প্রতিফলিত হয় লিঙ্গ-বৈষম্যের পরিণাম। তাঁর বৈষম্যের নিরীক্ষা গবেষণায় অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন এই সাম্যের অভাবকে উন্নয়নের ফলাফলেই মাপা সম্ভব। সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সব মাত্রাতেই।

বেঁচে থাকার প্রবণতা বা survival এর একটি অন্যতম সূচক। জন্মের সময়কার এবং পাঁচ বছরের মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের সংখ্যার অনুপাতে কিভাবে কমছে, সেন্সাসের তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে। এই কমে যাওয়া চলেছে গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরেই, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। জন্মকালীন শিশুকন্যার সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম হওয়ার পিছনে আছে লিঙ্গভিত্তিক গর্ভপাত দেশের আইন অনুযায়ী যা সাধারণভাবে অনুমোদিত নয়। অন্যদিকে ১-৫ বছরের শিশুকন্যার সংখ্যা কম হওয়ার কারণ শিশুকন্যার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ। খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিষেবায় বৈষম্যের পিছনে আছে কাজ শিশুটির যত্ন ও সুরক্ষা।

যে সব শিশুরা জন্মের সময় অথবা জন্মের পর শৈশবে অকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তাদের আমরা হারিয়ে যাওয়া বলে অভিহিত করি। কণ্ঠহীন, অস্তিত্বহীন এই মেয়েদের সংখ্যা প্রতি বছরই কোটিতে পৌঁছয়। এদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছেনা উন্নয়নের নানাবিধ নীতি সত্ত্বেও।

যেমন ধরা যাক PC PNDT (Prenatal Conception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994) এর মত একটি কেন্দ্রীয় আইন, যাকে পরবর্তীকালে সংশোধিত ও শক্তিশালী করা হয়েছে, তার অনুপালনের জন্য প্রশাসনের তাগিদ প্রায় নেই। কন্যাভ্রুণর লিঙ্গ নির্ধারণকে শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কারণ ছাড়া বেআইনি চিহ্নিত করে এই আইনটি কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কে। অথচ ডাক্তারদের সমঝোতা, নিঃস্পৃহতা, বড় ক্লিনিকগুলিতে দালাল চক্র সব মিলিয়ে জমজমাটভাবে চলেছে লিঙ্গ নির্ধারণ ও তাকে সাংকেতিক ভাষায় গর্ভবতীর পরিবার (মুখ্যত শ্বশুরালয়) কে জানিয়ে দেওয়ার কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। যতগুলি কেস এ অভিযোগ আসে, তার একশো ভাগের এক ভাগ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ডাক্তার বা ক্লিনিকের কোন শাস্তি হয়না - সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড়ের দায়িত্ব পুলিশের। তাঁদের এবং জেলা প্রশাসনের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। যে সংখ্যায় রাজনৈতিক প্রশাসনিক উচ্চবর্গীয়রা লিঙ্গ নির্ধারণের মধ্যে দোষের কিছু দেখেন না। এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম না দেওয়া

পর্যন্ত কন্যা সন্তানের গর্ভ বিমুক্ত করাই বিবাহিতা স্ত্রীর নিয়তি, সে দেশে এই আইন কার্যকরী হবে তা আশা করা কি সত্যই অসমীচীন? একটি স্পষ্ট আইন, তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং জেলা প্রশাসনের নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় মেশিন নির্মাতা ও বিক্রেতা কোম্পানিগুলির আগ্রাসী বাজার সন্ধান এবং সমাজে ডাক্তারদের প্রতিপত্তি, তার সঙ্গে সমাজের অন্তহীন পুত্রসন্তানের জন্য আকাঙ্খা তো রয়েছেই।

পুত্রসন্তানের জন্য সর্বজনীন আকুলতায় ভাঁটা পড়েনি বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অদ্ভুত বৈপরীত্য আমাদের সামাজিক আচরণে। একই সঙ্গে গার্হস্থ্য হিংসা, মদ্যপানের প্রাবল্য বাড়ছে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। বয়স্করাও হিংসার শিকার হচ্ছেন। কখনও সম্পত্তি কখনও সাংসারিক মনান্তরের কারণে। পুত্রসন্তান মাত্রেই যে শেষ বয়সে বাবা-মায়ের অবলম্বন, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য নয়। বরং কর্মরত

বিবাহিতা মেয়েরাও বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসছেন। এতৎসত্ত্বেও পুত্রসন্তানের জন্য আকুলতায় কোন ভাঁটা পড়েনি।

এই পরিস্থিতিতে কিছু অর্থনৈতিক পদক্ষেপ মেয়েদের সামাজিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করতে পারত। মেয়েদের নামে সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যুনতম ব্যঙ্ক সুদের ব্যবস্থা, রেজিস্ট্রেশন ফি লাঘব, গ্রামাঞ্চলে আরও বেশি করে কলেজ ছাত্রী মেয়েদের জন্য হস্টেলের সুবিধে, শহরে কর্মরত মেয়েদের থাকার উপযুক্ত আধুনিক ব্যবস্থা-এইসব পদক্ষেপের মাধ্যমে মেয়েদের জীবনের মান উন্নত হতে পারে, ক্ষমতায়ন দ্রুত হতে পারে, কিন্তু PCPNDT Act এর পরিপূরক হিসাবে এমন একটি নীতির কাঠামো তৈরি করার কথা সরকারের পক্ষে ভাবা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালে যা হয়েছে তার ভিত্তি সোজাসুজি ভর্তুকি। কন্যাশ্রীর টাকা, মেয়েদের সাইকেল (ছেলেদের সঙ্গে), ফি মকুব ইত্যাদি। এগুলি তাৎক্ষণিক কিছু আর্থিক আরাম দিলেও স্থায়ী পরিবর্তন আনতে অক্ষম।

Survival বা বেঁচে থাকার পরবর্তী ধাপ হ'ল জীবনের গুণমান। যে কন্যা জন্ম নিল, টিঁকে গেল, তার পরমায়ু সূচক কেমন, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পুষ্টির সূচক কোন অবস্থায় আছে দেখলে আমাদের নীতি অনুপালনের দিকটি স্পষ্ট হবে। এদেশে মেয়েদের অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রবণতা ছেলেদের তুলনায় ৪০% বেশি। স্বাস্থ্য পরীক্ষা তথা টিকাকরণের (Total Immunization) হিসাবে সারা দেশেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে পিছিয়ে। জন্মের একমাসের মাথায় পুরুষ শিশুর মৃত্যুর হার বেশি কিন্তু তারপর থেকে নানা সংক্রামক ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাধিতে মেয়েদের মৃত্যুর হার বেশি। এখানেও মেয়েদের সংখ্যার আরও বেশি পুনর্বিভাজন (Disaggregation) দরকার। দেখা যাচ্ছে যে দরিদ্র পরিবারগুলিতে, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর এবং পশ্চিম ভারতে কন্যাশিশুর টিকাকরণের হার কম। এইভাবে যদি সংখ্যার গড়কে আমরা ধর্ম, শ্রেণি ও অঞ্চলে পুনর্বিভাগ করে নেই, তবে আমাদের পক্ষে নীতির রূপায়ণ বেশি কার্যকর হবে।

Indian Human Development Survey থেকে তথ্য নিয়ে মরধ্বজ ও বোরা ২০১৬ তে যে গবেষণা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, টীকাকরণ ছাড়াও, হাসপাতালে চিকিৎসা, অথবা গুরুতর অসুখে চিকিৎসা না পাওয়া, শিক্ষিত, দক্ষ চিকিৎসকের কাছে পৌঁছতে না পারা; এইসব বিষয়ে লিঙ্গ বৈষম্য আছে দেশের সর্বত্র। সাধারণভাবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয়ের গড় মেয়েদের উপর কম ছেলেদের তুলনায়। বয়স বাড়লেও মেয়েদের অবস্থা শোধরায় না।

পুষ্টির ব্যাপারটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভবিষ্যৎ সুস্বাস্থ্যের সম্ভাবনা এর মধ্যেই নিহিত থাকে। ইউনিসেফের সূত্র অনুযায়ী গর্ভাবস্থা থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনের প্রায় ১০০০ দিনের পুষ্টি শিশুর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ শিশুর অতিরিক্ত পুষ্টির জন্য যে কর্মসূচী সারা দেশে আইসিডিএস প্রকল্পের মাধ্যমে নেওয়া হয়ে থাকে, তা শুরু হয় শিশুর জন্মের পর থেকেই। যে পুষ্টির অভাব থেকে মায়েরা গর্ভধারণ কালে ভোগেন, তার ফলে ৫০% শিশুরই ২ বছর বয়সের মধ্যে বৃদ্ধি পর্যাপ্ত হয়না।

মেয়েদের খাদ্য ও পুষ্টির উপর যদি তাদের শৈশবে-কৈশোরে জোর না দেওয়া যায়, যদি না তাঁদের শীঘ্র বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা, পরিবারের তরফে বন্ধ না করা যায়, গর্ভকালীন অবস্থায় তাদের যথোপোযুক্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করা না হয়, তবে এই সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। যত অতিরিক্ত কাজ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর উপর চাপিয়ে সরকার ভারমুক্ত থাকতে চান। কিন্তু এখানে একটি পরিপূরক ব্যবস্থা দরকার, যা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রাম স্তরে মায়েদের দল করতে পারে। অবিবাহিত কিশোরী মেয়ে ও মায়েরা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য, খাদ্যের পরিপূরক ভিটামিন, খনিজ, লোহা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি পাচ্ছেন কিনা সেই নজরদারির কাজ এইরকম একটি দল করতে পারে, অঙ্গনওয়াড়ির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেই।

এটা সত্যি যে আই সি ডি এস (ICDS) এর মত জাতীয় একটি প্রকল্প, যা ১৯৭৫ থেকে কাজ করছে। তা' না থাকলে শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান অনেক খারাপ

হত। কিন্তু ICDS যদি সঠিক দিশায় কাজ করত, আরও অনেক ভাল কাজ হতে পারত। বিশেষ করে তিন বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য।

আই সি ডি এস প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ৩-৬ বছরের শিশুরা এবং প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েরা। মায়েদের ক্ষেত্রে যেমন খাদ্যের বৈচিত্র্য, তাদের ওজন বৃদ্ধি এগুলির সমীক্ষা করতে আইসিডিএস তেমন সফল হয়নি। তেমনই তিন বছরের নীচের শিশুদের পুষ্টির দিকেও নজর দিতে পারেনি। এটা একটা বড় ফাঁক।

NFHS (National Family Health Survey) - এর তথ্য Round 4, 2015 থেকে দেখা যাচ্ছে, ICDS যোজনা যদিও নিজেরাই প্রচুর তথ্য উৎপাদন করে চলেছে, NFHS তথ্য তারা ঠিকমত ব্যবহার করতে চায়নি বা পারেনি। স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে তাদের সমন্বয় এই এত বছর পরেও তেমন মজবুত নয়। নীতি কার্যকরী করার বদলে এই দুর্বলতাগুলি মেরামত করার জন্য সরকার চেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের দূরের দৃষ্টি এত কম যে আজ-কালের কথা ভাবতেই সময় ফুরিয়ে যায়।

কিশোরী মেয়েদের পুষ্টির প্রশ্ন থেকে নাবালিকাদের বিবাহের কথায় আসি। সবচেয়ে বেশি শিশু বধূর বাস ভারতবর্ষে। ২০০৬ এ অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিবাহের হার ছিল ৪৭%, ২০১৫-২০১৬ এ কমে এসেছে ২৭%এ। জম্মু-কাশ্মীর ও কেরালাতে নাবালিকা বিবাহের হার কম। অথচ এ ব্যাপারে লজ্জাজনক ভাবে এগিয়ে রাজস্থান, বিহার ও বাংলা। ১৯৮১ থেকে হার কমে আসছে, তবে অবস্থা এখনও উদ্বেগ জাগায় মনে। একটি নাবালিকা বধূ মা হলে তার শিশু যে কি ভয়ানক গঠনগত সমস্যা, কম ওজন, অপুষ্টি নিয়ে জন্মাতে পারে, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রস্তুতি আমাদের পরিকাঠামোয় নেই। শিশু বিবাহ বন্ধ করার জন্য নানা রাজ্য বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছে। আইন কার্যকরী করতে ছাত্রীরা নিজেই থানার সাহায্য নিচ্ছে। আবার পরিবারের দারিদ্র্য ও অসুরক্ষার বোধের কাছে হেরেও যাচ্ছে তারা। বালিকা বিবাহ কেবল বৈধ বিবাহ নয়, নারী পাচারের একটি বড় পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব কন্যাশ্রী প্রকল্পে বার্ষিক ভাতা ও এককালীন সাহায্যের হিতাধিকারী ৫০ লক্ষ মেয়ে। বহু পুরস্কার ও সম্মান অর্জন করেছে যোজনাটি। তবুও সম্প্রতি আয়ের সীমা তুলে দিয়ে সব মেয়েদের এর আওতায় আনা হয়েছে। মনে হয়না এটার কোন প্রয়োজন ছিল। সীমিত অর্থের সদ্ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পদক্ষেপ সমীচীন মনে হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে অভিনিবেশ দেওয়া দরকার রাজ্যের দরিদ্রতম মেলাগুলির প্রতি। সবথেকে দরিদ্র গ্রামগুলিতে, বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলে, যেখানে মেয়েরা অনিশ্চিত জীবন যাপন করে। বিবাহের নাম কন্যা পাচারের ঘটনাও সবথেকে বেশি ঘটে এই সব অঞ্চলে। কিন্তু জনমুখী হওয়ার উদ্যমে সরকার বৈষম্য দূর করার চেষ্টাকে পাশে সরিয়ে রাখেন। এমনই ঘটে সাধারণত।

মেয়েদের স্কুলে ভর্তি ও স্কুলছুট হওয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক।

২০১১ সেন্সাস বলছে, শিক্ষার অধিকারের আওতায় যারা আসে, এমন ছাত্রছাত্রীদের ২০ শতাংশই স্কুলের বাইরে। সংখ্যাটা যথেষ্ট বড়। ৮.৪ কোটি। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে ভর্তির হিসেবে মেয়ে ও ছেলের ফারাক কমেছে। সমস্যা হচ্ছে তার পর। ভর্তির সময়েই শিক্ষার খরচ, বিয়ে করে মেয়ে পর হয়ে যাবে এইসব কারণ দেখিয়ে বাবা-মা মেয়েকে ভর্তি করতে চান না।

১৪ বছর বয়সের পর এই কারণগুলো বদলে অন্যরকম হয়ে যায়। স্কুলে ও বাড়িতে সুরক্ষার অভাব, বিয়ের বয়স এসে যাওয়া, দ্রুত বিয়ে দেওয়ার তাগিদ, সংসারের কাজে মেয়েদের দরকার ইত্যাদি।

যে সব মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হয়, তাদের একটা বড় অংশ পরে স্কুল ছুট হয়ে যায়। এখানেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, স্কুলছুট মেয়েদের (ছেলেদেরও) একটা বড় অংশ আদিবাসী ও অনুসূচিত জনজাতির।

যাদের নাম স্কুলের খাতায় উঠলনা, অথবা যারা স্কুল ছুট হয়ে বাড়িতে রয়ে গেল অথবা নাবালক শিশু শ্রমিকে পরিণত হল, সেই দরিদ্রতম আদিবাসী-অনুসূচিত জাতির মেয়েদের অধিকার দিয়ে আমরা কখনও খুঁজে বার করতে ছেয়েছি কি? যেখানে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা আছে, সেখানেও সরকারের চোখ থাকে মেধাবীদের জন্য আরও দ্রুত উপরে উঠবার ব্যবস্থা করার দিকে। কিন্তু যারা পিছিয়ে পড়ার ফলে দেশের ভবিষ্যৎ আরও একটু অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে, তাদের জন্য আমরা চিন্তা বা সময় দিতে পারিনা। আমাদের আমাদের যোজনা বা প্রকল্পগুলি পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রী বা প্রান্তিক মানুষের জন্য পিছন ফিরে তাকানোর ব্যবস্থা রাখেনি।

মেয়েদের শ্রমের বাজারে যোগদান নিয়ে ইদানিং আক্ষেপ শোনা যাচ্ছে জাতীয় স্তরে নীতি প্রনেতাদের। নীতি আয়োগ কিছুদিন আগে বললেন, যদি শ্রমের বাজারে যোগদান দশ শতাংশও বাড়ত তাহলে জাতীয় উৎপাদনে যোগ হত ৭৭০ বিলিয়ন ডলার। মেয়েরা কেন আরও বেশি সংখ্যায় আসছেন না যোগ দিতে তা নিয়ে নীতি

প্রণেতারা চিন্তিত নন। সংগঠিত ক্ষেত্রে বিশেষ করে আই টি সেক্টরে মেয়েদের জন্য নিরাপত্তা, গাড়ি, নিরাপত্তা কর্মী, পোশাক বদলের জায়গা, শৌচাগার ইত্যাদির সুবিধে দেওয়ার জন্য নানা রাজ্য তাঁদের Shops and Establishment Act এর পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু যদি সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় পরিবহণ ব্যবস্থা, সুরক্ষিত পরিকাঠামো, রেস্ট রুম, শৌচাগার ইত্যাদির অভাব এখনও মেয়েদের জন্য কর্মপরিসরকে আকর্ষক করে তোলেনি।

কর্মপরিসরে যৌন হেনস্থার প্রতিরোধে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আইন হয়েছে ২০১৩ সালেই। [The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013] অথচ এখনও সরকারি, বেসরকারি বহু অফিসে কমিটি নেই। কোথাও কমিটির সদস্যরা স্থানান্তরিত হয়েছেন অথচ প্রতিস্থাপন হয়নি। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ছাঁটাই এবং তার আগে টিম থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা অনেকসময় আলোতেই আসেনা। আমাদের নিজস্ব পরিসরের তৈরি হওয়া আইনি

কাঠামোর ব্যবহারও আমরা সুনিশ্চিত করতে পারছিনা, কারণ এটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ অফিসের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্পোরেট বসেরা কখনই পান না। অথচ মহিলা ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ করা যেতে পারত। যে দেশে জাতীয় মহিলা কমিশনকেই একটি সুপারিশ সর্বস্ব সংস্থায় পরিণত করে রাখা হয়েছে এবং মন্ত্রকের তত্ত্বাবধান থেকে তাঁদের মত স্বয়ংশাসিত সংস্থারও নিস্তার নেই, সেখানে অন্য সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে মেয়েদের সুরক্ষা বিষয়ে কি সংবেদন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তা ভাবলে উদ্বিগ্ন হতে হয়।

অন্যদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারীর সুরক্ষার কোন প্রকৃত ব্যবস্থাই নেই। কারণ শ্রম আইনের আওতায় আসেনা অধিকাংশ কাজ। এইসব ক্ষেত্রে শ্রম অমূল্যায়িত বা অবমূল্যায়িতই থাকে। শ্রমের যোগান অবশ্য নারীর দিক থেকে চলেছে নিরন্তর। সংসার ও সমাজের চাকাটি ঘুরছে তার অবমূল্যায়িত শ্রমেই। জল আনা, জ্বালানি সংগ্রহ, শিশুর যত্ন, কৃষির কাজ,পাহাড়ে ঝুম চাষের জমি তৈরি, ধান বোনা বা রোয়া, নিড়ানো, ঝাড়াই,

বাছাই- সব কাজের ৭০ শতাংশের বেশি মেয়েরাই করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা পুরুষদের সমান মজুরি পায়না। ন্যুনতম মজুরির আইনে বৈষম্য নেই। কিন্তু যেখানে আইনই নেই সেখানে বৈষম্য কে ঠেকাবে?

সবচেয়ে করুণ অবস্থা সেই মেয়েদের যারা কাজের খোঁজে একা বা সপরিবারে রাজ্যের বা এলাকার বাইরে যায়। ইঁটভাটা, গৃহনির্মাণ, চাষের কাজ এমন বহু কাজে। Interstate Migrant Labour Act বহাল থাকা সত্ত্বেও শ্রমবিভাগগুলি ঠিকাদারদের নথিভুক্তি এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা নিয়ে একেবারেই তৎপর নয়। মেয়েরা অনেকেই যৌন লাঞ্ছনা, ধর্ষণ ও দীর্ঘ কর্মদিবসের শোষণের মধ্যে পড়ে যান। মাতৃত্বের ছুটি, চিকিৎসার সুবিধে এসব কিছুই তাদের নতুন কাজের জায়গায় থাকেনা। অথচ রাজ্যের ও কেন্দ্রের শ্রম বিভাগ সামান্য তৎপর হলেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলে Automatic Transportability of Benefits- যেমন মোবাইল ফোনের নম্বরের ক্ষেত্রে করা হয়, তা স্বাস্থ্য, রেশন ও অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে চালু করা যায়। এর জন্য আলাদা কোন খরচ

নেই। শ্রমিক যে সব সুবিধা নিজের গ্রামে বা শহরে পান, তা তিনি নতুন কর্মক্ষেত্রেও পেতে পারেন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে।

যে পরিবেশের মধ্যে একজন সাধারণ নারীকে জীবন কাটাতে হয়, তার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের নথিভুক্ত কেসগুলির হিসাব দেখলে। ২০১৫ তে অপরাধের হার সার্বিকভাবে ৩% কমেছে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধির গ্রাফকে কিছুটা নামিয়ে। তবে এতে আমাদের উল্লসিত হওয়ার কোন কারণ নেই। সারা দেশে ঘটেছে ৩,২৭,৩৯৪টি কেস, এগুলির অগ্রগতি, সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় এবং শেষ পর্যন্ত শাস্তিবিধান পর্বে পৌঁছতেই পেরিয়ে যায় বহু বছর। Rate of Crime, অর্থাৎ ১০০,০০০ মহিলা জনসংখ্যার হিসাবে কেস এর সংখ্যা ধরলে উপরের দিকে আছে দিল্লি, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা। তুলনায় এই অনুপাত মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও গুজরাতে কম। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এই অনুপাত ৩৪.৮ ও ২৭.৯। দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে অপরাধ ঠিকভাবে নথিভুক্ত হচ্ছেনা। ২০১৫ তে দেশে ঘটেছে ৩৪,৬৫১টি ধর্ষণের ঘটনা।

২০১১-১৫ এর মধ্যে IPC Crimes এর শতাংশ হিসেবে মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ বেড়েছে, ৯.৪ থেকে ১০.৭ শতাংশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৪ সালে কাস্টডি ধর্ষণের ঘটনা উত্তরপ্রদেশে সবথেকে বেশি। গণধর্ষণের ঘটনাতেও উত্তরপ্রদেশ শীর্ষে। National Crime Record Bureau এর তথ্য বিশ্লেষণ করে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগগুলি নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের দ্রুত ফয়সলা সময়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ নিয়ে কোন নির্দেশ থানাগুলিকে দিয়েছে কিনা, তা জনসমক্ষে আসেনি। আসলে ভাল হত। সব কেস থানা পর্যন্তও আসেনা। এলেও অভিযোগকারিনীর পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া সমঝোতা করে নিতে বলার অনুচ্চারিত ঘটনাও খুব কম নয়। যে সব পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে বছরে ২০০০ এর বেশি কেস দাখিল হয়েছে তার মধ্যে আছে দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া। এইসব থানা বা জেলা নিয়ে নিবারণ মূলক পদক্ষেপ হতে পারত। অন্তত এগুলিকে অগ্রাধিকার মনে করলে, পদক্ষেপগুলি জনসমক্ষে আসত। তা হয়নি। সারা দেশেই পুলিশ ক্রাউড কন্ট্রোল ও ভি

আই পি ডিউটিতে নিযুক্ত। অপরাধের তদন্তের জন্য আলাদা পুলিশ আধিকারিক নেই। ২০১৭ সালের শেষে ৩০%এর মত কেসের তদন্ত পুলিশ করে উঠতে পারেনি। কোর্টের অবস্থা আরও করুণ। ৮৮% কেস কোর্টে বিচারাধীন। ২০১৬ র থেকে অবস্থা সংখ্যার দিক দিয়ে ভাল, ২০০১ এর চেয়ে খারাপ।

বিশ্লেষণের পর বলা যায়, লিঙ্গ সচেতন নীতি প্রণয়ন বা কার্যকর করার বাধা হল লিঙ্গ ভিত্তিক তথ্যের অভাব, অথবা সেই তথ্য ব্যবহার করতে না পারা, অথবা না চাওয়া। কেবল লিঙ্গ ভিত্তিক পরিসংখ্যানই নয় দরকার আরও নানা শ্রেণীতে বিভাজিত (Disaggregated) তথ্য। যেমন দলিত/আদিবাসী নারী অথবা দরিদ্র পরিবারের কর্ত্রী নারী-অথবা দুয়ের সমাপতন যুক্ত কোন সূচক। যেহেতু সরকারের হাতে অর্থ পর্যাপ্ত নয়, তথ্য উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার না হলে সম্পদের সম্যক ব্যবহার সম্ভব নয়। তথ্যের বিশ্লেষণ মন্ত্রকে, বিভাগে পদস্থ আধিকারিকদের জন্য হলেও গ্রাম বা পঞ্চায়েত অথবা ব্লক স্তরে তার তাৎপর্য বোঝানোর কোন সার্বিক চেষ্টা নেই। মেয়েদের বিষয়ে তথ্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ

হত না, যদি মেয়েরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে-বাইরে এতটা সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার না হত।

জন্মের আগে থেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির বাজার তাদের প্রান্তিক করে রাখতে সচেষ্ট। উন্নয়নের অগ্রগতি ক্রমশই আরও শক্তিশালী করে তুলেছে বাণিজ্য ও শিল্পগোষ্ঠীদের। কিছুটা ভর্তুকি সোজাসুজি পৌঁছে দেওয়া ছাড়া বৈষম্যের প্রতিকারে সরকার আর কিছু করতে অনিচ্ছুক।আইনে কোন বৈষম্য নেই। সংবিধান দিয়েছে সমানাধিকার। কিন্তু নীতির রূপায়ণ ও প্রয়োগের জন্য যে সচেতন তৎপরতা দরকার প্রাথমিকতার বোধ, এবং তার অভাব আমাদের সেই উন্নয়নের পরিকল্পনাকে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে রাখছে।

Late Krishna Bhattacharya

Distinguished Teacher of Education,
West Bengal Education Service

KRISHNA MEMORIAL AWARD 2020

NAZNIN MULLICK
Educationist from Howrah, West Bengal

PUNAM TOPPO
Theatre Activist of Ranchi, Jharkhand

DOOARS JAGRON
Working for Education of Women in Tea Plantations in Dooars, Jalpaiguri, West Bengal

Krishna Trust

HB-232, First Floor, Sector-III, Salt Lake
Kolkata-700 106, Phone +91-33-23371801